BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03030012

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 03| March 2025| e-ISSN: 2584-1890

নৈতিক-অনৈতিকতায় ভারতীয় মহাকাব্যের চরিত্ররা : একটি সমীক্ষা

কোয়েল ঘোষ

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত), পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Email: jhumur.ghosh555@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

মানুষের মনে প্রাচীন নৃপতিগণের, লোকোত্তর বীরপুরুষগণের ও দেবতাগণের কাহিনী শোনার শাশ্বত প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করে যুগে যুগে যেসব কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রথম সুসম্পূর্ণ সংকলন হল রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্য। বেদ থেকে রামায়ণ মহাভারত পর্যন্ত ভারতীয় আর্যগণের একই জিজ্ঞাসা-জীবনের রহস্য কী? পরিণতি কোথায়? জীবনকে সমৃদ্ধ ও সার্থক করা যায় কী রূপে? আর্যগণ এই শাশ্বত প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন মননের মধ্য দিয়ে। এই প্রশ্নগুলি যেমন সেকালের বৈদিক যুগের অনুসন্ধানের বিষয়, একইভাবে তা দর্শনের বিষয়। এই দুই মহাকাব্যেই বীর নৃপতিগণের বীর্যগাথাসমূহ মূল উপজীব্য হলেও, তার সঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে নীতি ও ধর্মের কথা, ত্যাগ, মৈত্রী, অহিংসা, জাগতিক বিষয়ে অনাসক্তি, নিষ্কাম কর্ম, জন্মান্তরবাদের নানাবিধ আখ্যান মাল্য।

দর্শনের একটি অন্যতম শাখা হল নীতিশাস্ত্র সেখানে মূলত মানুষের স্বেচ্ছা আরোপিত কর্মের ন্যায্যতা অন্যায্যতা, ভালো-মন্দ নিয়ে চর্চা করা হয়। আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসাবে নীতিশাস্ত্র মূলত মানুষের শুভবোধ, বিবেকের নির্দেশে কর্ম সম্পাদন, পরহিতসাধন এককথায় মনুষ্যত্বের উচ্চতর প্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করে। সেইদিক থেকে বিচার করলে মহাকাব্যে, পুরাণে উল্লেখিত কাহিনীর মধ্যে সেই নৈতিক আদর্শের কথা মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করানোই অন্যতম উদ্দেশ্য সেটা নির্দ্বিধায় বলা যেতেই পারে।

আমার এই আলোচনা পত্রে ভারতীয় দুই মহাকাব্য অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারতে কিছু অবিস্মরণীয় চরিত্র বা নায়ক (Hero)-এর যে আদর্শগাথা তথা মহানুভবতার কথা উল্লেখিত হয়েছে, নৈতিক মানদণ্ডে তা কতখানি গ্রহণযোগ্য, সেটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আলোচনাপত্রের দ্বিতীয়পর্বে হাজার হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন কাহিনীগুলির বর্তমান যুগেও আদৌ প্রাসঙ্গিক কিনা সেটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

মূল শব্দ: *রামায়ণ, মহাভারত, মহাকাব্য, দর্শন, পুরাণ, নীতি ও ধর্ম কথা, নৈতিকতা, অনৈতিকতা।*

মূল আলোচনা:

প্রথম পর্ব:

রামায়ণের যে ঘটনাগুলি অমানবিক বলে পীড়াদায়ক ও একই সঙ্গে নৈতিকতার পরিপন্থী তার মধ্যে প্রধান হল শম্বুক বধ, বালী নিধনে শ্রী রামচন্দ্রের সুগ্রীবের পক্ষাবলম্বন এবং সর্বোপরি সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও নির্বাসন।

শম্বুক নিধন:

সব মানুষেরই শিক্ষার অধিকার আছে, আত্ম উন্নতির অধিকার আছে। কিন্তু অন্ত্যজ শ্রেণী হওয়ায় একজন শুদ্রক হয়েও বেদপাঠ ও তার তপস্যা যে সামাজিক অনুশাসন বিরুদ্ধ এই জাতিগত বৈষম্য তৎকালীন রামরাজত্বেও বিদ্যমান ছিল। এই কাহিনীর পটভূমি হল রামরাজ্যে এক ব্রাহ্মণ শিশুর অকালমৃত্যু হয়েছে। ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্যই দেখানো হয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরা এত পুণ্যবান যে তাঁদের অকালমৃত্যু হয় না। সুতরাং শূদ্রের বেদপাঠ ও তপস্যার সঙ্গে এই অকালমৃত্যু কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। এই কারণেই ন্যায়াধীশ শ্রীরাম নিরপরাধ শম্বুকের শিরোচ্ছেদ করলেন এবং শূদ্র জাতিরা স্বর্গে পদার্পণ করতে পারলো না বলে কৃতজ্ঞ দেবতারা রামকে বরদান করলেন।

গৃহাণ চ বরং সৌম্য যং ত্বমিচ্ছস্যরিন্দম্
স্বর্গভাঙন হি শূদ্রোহয়ং ত্বৎকৃতে রঘুনন্দন।
(রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড, ৭৬/৮)

মহাকবি কালিদাস শ্রীরামের চরিত্রিক মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিলেন। 'রঘুবংশ'-এ (১৪/৪৬-৪৭) দেখালেন যে, শ্রীরাম দৈববাণীর আদেশ খুঁজতে বেরোলেন, তাঁর প্রজাদের মধ্যে কে 'অপপ্রচার' করছে। খুঁজতে খুঁজতে দেখলেন এক ব্যক্তি গাছের ডাল থেকে অধঃশিরা হয়ে ঝুলে তপস্যা করছে। তখন পরিচয় জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, সে একজন শূদ্র নাম শম্বুক। অতএব রাম সেই অনধিকারী-র শিরোচ্ছেদ করলেন। কিন্তু মৃত্যুর পর শম্বুক স্বর্গে গেল, কারণ স্বয়ং রামের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এভাবে রামের চরিত্র চিত্রণ করায় রামের যে দোষ স্খলন হয়ে যাচ্ছে, একথা কোনভাবেই বলা যায় না। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একজন নিরপরাধ মানুষ যে কিনা শিক্ষাগ্রহণের নিমিত্ত তপস্যা করে যাচ্ছে, শ্রীরাম তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে 'হত্যা' করলেন।

বালী নিধন:

শতাব্দী পূর্বে রামায়ণকার লিখে গেছেন যে, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধের সময় রাম তাঁর মিত্র সুগ্রীবের পক্ষ অবলম্বন করে নেপথ্যে থেকে বালীকে অতর্কিতে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করেন। এখন এই কাজটি কোনভাবেই বীরোচিত কাজ না প্রকৃত যোদ্ধার পরিচয়? এর মধ্যে কোন মানবিক মহত্ব দেখা যায় না।

পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে এই 'হানিকর' ঘটনার ওপর যথাসম্ভব প্রলেপ লাগিয়ে পুনর্নির্মাণ করার প্রয়াস দেখা যায়। ভবভূতির 'মহাবীরচরিত'-এ দেখা যায়, বালী ও রামের মধ্যে সম্মুখসমর হয়েছিল। বালীও শ্রীরামের একজন বড় ভক্ত, কিন্তু রাবণের সঙ্গে সখ্যতাবশত মাল্যবানের অনুরোধে তিনি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিল। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে 'নায়কের' মহিমা অক্ষুন্ন রাখতে নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যায় কর্মকেও ভিন্নভাবে, ভিন্ন আঙ্গিকে সমস্ত দোষ-পাপবর্জিত মহাপুরুষভাবে চিত্রিত করা হয়েছে।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও নির্বাসন:

সীতার প্রতি রামের অন্যায় আচরণ যুগযুগান্ত ধরে মানুষের মনকে পীড়া দিয়ে এসেছে সমগ্র নারীজাতির প্রতি অপমান ও হৃদয়হীনতার প্রতীকরূপে। রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষা হয় কারণ রাম মনে করেন 'পরপুরুষের' ঘরে দীর্ঘকাল ধরে বাস করায় এবং সীতাহরণের সময় পাপী রাবণের কলুষিত দৃষ্টি ও স্পর্শ সীতার দেহে পড়ায় সীতাকে কলঙ্কমুক্ত করার জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। এমনকী সীতাকে যার সঙ্গে ইচ্ছা হয়, তার সঙ্গেই চলে যেতে পারেন, এই বিধানও দেওয়া হয়। (রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড, ১১৫/১৫-২৩)। এই অপমানের প্রতিবাদ স্বরূপ সীতা অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অগ্নি ও অন্যান্য দেবতারা এসে সীতার শূচিতার সাক্ষ্য দেওয়াতে রাম তাঁকে ফিরিয়ে নিলেন ও বললেন, তাঁর নিজের সীতার বিষয়ে কোন সন্দেহ

নেই, তিনি শুধুমাত্র প্রজাগণের বিশ্বাস জন্মাতে এই কাজ করেছেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'অভিষেক' নাটকে অগ্নিপরীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, রাম এখানে বলছেন— "আমি সীতার শূচিতা জেনেও লোকের বিশ্বাস জন্মাবার জন্য একাজ করছি।"

জানতাপি চ বৈদেহ্যা শূচিতাং ধূমকেতন।
পপ্রত্যয়ার্থং হি লোকোনামেবমেব ময়া কৃতম্।।
(অভিষেক, ষষ্ঠ অঙ্ক)

সীতা এতই পবিত্র যে অগ্নি তাঁকে দহন করতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজত্ব করার কিছুকাল পরে আবার যখন সীতার চরিত্র নিয়ে প্রজাদের মধ্যে কানাকানি ওঠে, তখন রাম সীতাকে কিছু না জানিয়েই গর্ভবতী অবস্থায় তাঁকে নির্বাসন দিলেন। কালিদাসের রঘুবংশে আছে সীতা যখন জানতে পারলেন, রাম তাঁকে ত্যাগ করেছেন, তখন তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, রাজা রামের উদ্দেশ্যে এই বার্তা নিয়ে যেতে যে আমি তোমার সামনেই অগ্নিশুদ্ধা হয়েছিলাম তা সত্ত্বেও আমাকে লোক অপবাদ শুনে যে ত্যাগ করা হল, সেটি কি তাঁর প্রসিদ্ধ বংশের উপযুক্ত হয়েছে? রাম সীতাকে তপোবনে নির্বাসনে পাঠালেন, কিন্তু তাঁর খোঁজখবর নেওয়া, আদৌ বেঁচে আছেন কিনা, কোন সন্তান প্রসব করেছেন কিনা— তাঁর কোন খবর নেওয়ারই প্রয়োজন মনে করলেন না। রামের আর কোন সন্তান ছিল না, তাই আকস্মিকভাবে তিনি লবকুশের সন্ধান পেলেন, তাদের সন্তান বলে গ্রহণ করলেন এবং পুনরায় সীতাকেও গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু এখানেও তিনি আবার সীতাকে আরো একবার অগ্নিপরীক্ষা দিতে ডাকলেন। কিন্তু সীতা এখন দুই সন্তানের জননী ও বাল্মীকির আশ্রমে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত। সীতা এই অবমাননাকর প্রস্তাবে সম্মত হলেন না— তাঁর মাতা ধরিত্রীকে ডেকে তিনি বললেন, "আমি যদি বাক্ মনঃ, কর্মের দ্বারা কখনও স্বামীর প্রতি ব্যভিচারিণী না হয়ে থাকি, তবে হে মাতা বিশ্বম্ভরা ধরণী! তুমি আমাকে অন্তর্নিহিত কর।"

সীতার এই স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন সমগ্র নারীজাতির কাছে লজ্জার, অসহায়তার দৃষ্টান্ত হিসাবেই থেকে যায়। রামের এই পত্নীত্যাগের দৃষ্টান্ত কোনভাবেই নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করা যায় না।

রামায়ণের আরো একটি উপাখ্যান যা, নীতি বহির্গত কর্মের দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিগণিত হতে পারে সেটি অবশ্যই লক্ষ্মণ কর্তৃক রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ নিধন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎ যখন আসন্ন যুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্য পুজোর্চনায়রত তখন বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ অতর্কিতে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করে। মাইকেল মধুসূদন বিরচিত ঐতিহাসিক 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এই ট্র্যাজিক ঘটনার অসাধারণ বর্ণনা আমরা পাই। চিরাচরিত মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপট যেখানে শ্রী রামচন্দ্রকে দেবতা হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, তার সোচ্চার প্রতিবাদ স্বরূপ মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই কাব্যটি চয়ন করেন। সমগ্র পাঠককুল ট্র্যাজিক নায়করূপে রাবণ, তাঁর চরিত্র, বীরত্ব এবং তাঁর প্রতি অনৈতিক আচরণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

শকুন্তলার কাহিনী:

একই রকম একটি কাহিনী যেখানেও আমরা দেখতে পাই নারীর প্রতি বঞ্চনা ও অপমানের এক করুণ পরিণতি— সেটি হল মহাভারতের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার কাহিনী। মহাভারতের কাহিনীতে দুষ্মন্ত গান্ধর্বমতে শকুন্তলাকে বিবাহ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার বেশ কিছু বছর পরে, শকুন্তলা যখন তাঁর পুত্রকে নিয়ে রাজসভায় আসেন, তখন দুষ্মন্ত ইচ্ছে করেই তাঁকে চিনতে চাননি লোক-লজ্জার ভয়ে। শকুন্তলা রাগে, দুঃখে যখন তিরস্কার করে চলে যাবেন সেইসময় দৈববাণী হল— শকুন্তলা দুষ্মন্তের পত্নী ও বালকটি তাঁর ঔরসজাত সন্তান। কালিদাস তাঁর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ এই ঘটনাটির ওপর একটি মায়াপর্দা রচনা করে বিষয়টির নিষ্ঠুরতা হ্রাস করতে চেয়েছিলেন মহামুনি দুর্বাসার অভিশাপ দিয়ে। ঘটনাটি এইরকম শকুন্তলা দুষ্মন্তের চিন্তায় এতটাই মগ্ন ছিলেন ঋষি দুর্বাসার অতিথি সৎকার করতেই ভুলে যান। তার ফলস্বরূপ দুর্বাসা অভিশাপ দেন যাঁর চিন্তায় তুমি অবমাননা করলে, সে তোমাকে কিছুতেই চিনতে পারবে না। পরে শকুন্তলার সখীর কাতর বিলাপে সাড়া দিয়ে ঐ অভিশাপ কিছু লঘু করে দেন, কোন অভিজ্ঞান দেখাতে পারলে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারবেন। একদা দুষ্মন্ত যে আংটি শকুন্তলাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন সেটি হারিয়ে যাওয়ায় দুষ্মন্ত-র বুদ্ধিভ্রম হয়েছিল। অর্থাৎ এখানে কালিদাস দুষ্মন্তের মহিমা অক্ষুন্ন রাখতে দুর্বাসার

অভিশাপ নামক ঘটনা সংযোজন করেন, যাতে করে দুষ্মন্তের চরিত্র নিষ্কলুষ থাকে। মূল কাহিনীতে নারীর ওপর যে অপমান আছে, তাকে মোছার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র, কিন্তু এতে করে দুষ্মন্তের চারিত্রিক গ্লানি দূর করা যায়নি, নৈতিকতার দৃষ্টিতেও এটা 'ভালো কাজ' এই উপমা কোনভাবেই দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় পর্ব:

এ তো গেল মহাকাব্যে নায়কদের চরিত্রে প্রচ্ছন্ন অনৈতিকতার কথা। কিন্তু মহাকাব্যে, পুরাণে যে কাহিনী যুগে যুগে মানুষের হৃদয়কে, মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করেছে তার নৈতিক ব্যাপ্তি নেই একথাও কোনভাবেই উচ্চারণ করা যায় না। মানুষের মননে যে কাহিনীগুলির জয়গাথা আজও অম্লান তার মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে আমার প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বে আমি আলোচনা করব। যার প্রাসঙ্গিকতা হাজার হাজার বছর পরেও নিজ দ্যুতিতে অম্লান হয়ে আছে।

ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু:

নীতিবিদ্যার একটি অন্যতম শাখা হল ফলিত নীতিবিদ্যা। যেখানে মানুষের ব্যবহারিক নীতিবোধ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি পরিস্থিতি মাফিক বিচার করা হয়। এই ফলিত নীতিবিদ্যা চর্চায় একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল স্বস্তিমৃত্যু বা euthanasia, যাতনাহীন স্বচ্ছন্দ মৃত্যুকে এক কথায় স্বস্তিমৃত্যু বলতে পারি যেখানে মৃত্যু আশীর্বাদ রূপে পরিগণিত হয়। এই স্বস্তিমৃত্যুর একটি অন্যতম ভাগ হল ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু voluntary euthanasia যেখানে সাধারণভাবে বলা হয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী নিজেই তার মৃত্যু ঘটানোর প্রস্তাবে সায় দেয় বা মৃত্যুভিক্ষা চায়।

ঠিক এইরকমই মৃত্যুর দৃষ্টান্ত আমরা দেখি মহাভারতে ধর্মাত্মা ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু নেওয়ার কাহিনীতে। পিতা শান্তনু যখন সত্যবতীকে বিবাহ করেন, তখন তুষ্ট হয়ে ভীষ্মকে দুই বর দিয়েছিলেন ইচ্ছামৃত্যু ও যুদ্ধে অবধ্যত্ব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম পাণ্ডবপক্ষের সহস্র সৈন্যাদি নিহত করেন। দীর্ঘ যুদ্ধে প্রাণি নিধন থেকে বিরাগবশত ভীষ্ম তাঁর মৃত্যু কামনা করলেন এবং অর্জুনের বাণে বিদ্ধ হয়ে শরশয্যা গ্রহণ করলেন। তিনি যখন শরশয্যায় শায়িত তখন সূর্যের দক্ষিণায়ন চলছে। মৃত্যুর সময় দক্ষিণায়ন অশুভ বলে ভীষ্ম ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে সূর্য যখন উত্তরদিকে গিয়ে সর্বলোক প্রতপ্ত করবেন তখন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। অর্থাৎ মৃতপ্রায় ভীষ্ম আর পুনরায় প্রাণ ফিরে পাবার আশায় নিয়োজিত না থেকে শান্তচিত্তে তাঁর মৃত্যুকে স্বস্তিদায়ক করলেন।

বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র নেদারল্যান্ডই ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু আইনগত স্বীকৃতি পেয়েছে। এমনকী ভারতবর্ষেও ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু রাষ্ট্রকর্তৃক অনুমোদিত নয়। অথচ ভাবতে অবাক লাগে 'ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু' নেওয়ার ঘটনা এই ভারতের বুকেই ঘটেছিল। আশা রাখতেই পারি কোন একদিন যাতনাহীন মৃত্যুর অধিকার এই দেশেও আইনগত স্বীকৃতি পাবে।

ভগবৎগীতা:

মহাভারতের বিস্তৃত দার্শনিকতার সুসংহত রূপ গীতা যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আধুনিক ভারত তথা বিশ্বের বহু মানুষের প্রেরণাস্থল সে-টি অনস্বীকার্য, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রিয়জন বধে ভয়ার্ত, বিষাদগ্রস্ততা অর্থাৎ যুদ্ধ করতে অনীহা দেখা দিলে অর্জুন পরম পুরুষ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করলে তিনি যে উপদেশ প্রাপ্ত হন তাই 'গীতা'। অর্জুন এর এই প্রকার চিত্ত চাঞ্চল্য দেখে শ্রীভগবান তাকে বলেন 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' -অর্থাৎ ক্লীবতা ত্যাগ করে যুদ্ধ ক্ষেত্র যাও। যে কোন মহৎ কর্ম সাধিত করতে গেলে মৃত্যুভয় অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে অন্যথায় কোন বৃহৎ বা মহৎ কর্ম সাধিত হয় না। গীতার এই নৈতিক উপদেশ সর্বকালে সর্বসমাজে শাশ্বত হয়ে আছে।

সাতশো শ্লোকের এই বইটি পাঠ করে যুগযুগান্তের মানুষ পেয়েছে পরম প্রশান্তির হদিশ। একদিকে বাস্তবের কঠোর দাবি অন্যদিকে ধর্ম-অধর্মের বোধ এই দুই-এর মাঝখানে পড়ে সাধারণ মানুষ যখন উদভ্রান্ত, গীতা তাকে দেখানোর চেষ্টা করেছে, কীভাবে এই দুই পথের মধ্যে সংগতি সাধন করা যায়। এই পথ কর্ম পরিত্যাগের পথ নয়। বরং স্বধর্মে আশ্রিত থেকে প্রিয়-অপ্রিয় সবরকম কর্ম করে যাওয়ার পথ। সংসারী মানুষের কাছে গীতা দেখায় যে কর্মের ফলাফলের কথা চিন্তা না করে, কেবল

কর্তব্য সাধন করে যাওয়াই শ্রেয়। স্বধর্মনিষ্ঠ কর্তব্যকর্মের ফলাফলের দায় কর্মকর্তার ওপর বর্তায় না, দায় বহন করবে স্বয়ং ঈশ্বর। এটাই হল গীতার সুবিখ্যাত নিষ্কামকর্মতত্ত্ব।

নিষ্কাম কর্ম:

ফল ও আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের আদেশ অনুসারে শুধু তাঁর জন্যই বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে কর্ম করাকে বলা হয় নিষ্কাম কর্মযোগ। অনাসক্ত কর্মই কেবল মোক্ষলাভের পথে সহায়ক হয় ('পরমাপ্নোতি পুরুষ', গীতা-৩/১৯)। এই কর্ম কেন সহায়ক? গীতাকার স্বয়ং উত্তর দিয়েছেন এইভাবে— অনাসক্ত বা নিষ্কাম কর্মের পাপপুণ্যধর্মী নৈতিক ফল বলে কিছু থাকে না। তাই নিষ্কাম কর্মযোগীকে কর্মফলের দায় বহনকল্পে সংসারে পুনর্জন্ম নিতে হয় না। অষ্টাদশ অধ্যায়ে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, নিষ্কাম কর্তা নরহত্যা করলেও প্রকৃতিপক্ষে কারোর হত্যাকারী হন না এবং সেইজন্য তাঁকে এই কর্মের ফল ভোগকল্পে সংসারে আবদ্ধ হতে হয় না।

গীতার প্রাসঙ্গিকতা কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। গীতার অবদান অপরিসীম। গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'যুদ্ধ কর', যে যুদ্ধ হবে ন্যায়যুদ্ধ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর— এই যে বাণী তা মানব হৃদয়ে নিরন্তর প্রদীপের আলোকশিখার ন্যায় প্রোজ্জ্বল্যমান। প্রত্যেক মানব হৃদয় ন্যায় যুদ্ধ-নৈতিক যুদ্ধের প্রতি আস্থাশীল। এর ওপর সমাজ-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। গীতায় বর্ণিত যুদ্ধ জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও ত্যাগের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণে তা ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধ স্থিত প্রজ্ঞ ও অহিংস হয়েও করা যায়। বর্তমান সমাজ জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও ত্যাগের সমন্বয়ে যুদ্ধে সর্বত্র জয়লাভ করে চলেছে।

স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে, বিপ্লবীদের আধ্যাত্মিক চেতনার আশ্রয় ছিল গীতার নৈতিক বাণী—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ
তস্মাদ পরিহার্য্যেহর্ম্মেন ত্বং শোচিতুর্মহসি

অর্থাৎ, জাতমাত্রে মৃত্যু ধ্রুব, জন্মে মৃত্যু নিশ্চিত

যে কোনো বিষয়ে (ভালো বা মন্দ) শোক করা উচিৎ নয়।

মহাকাব্য মহাভারতে 'গীতা' নিয়ে পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই গুণী-জ্ঞানী সমাজে ব্যাপকভাবে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ কখনো কোথাও বিরূপ আলোচনার স্বীকার হয়নি। গীতায় যে আধ্যাত্মিকতা তথা নিষ্কামকর্ম তত্ত্বের মহান নৈতিক উপদেশ আছে তা আজও বর্তমান সমাজ সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

পরিশেষে যে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে গীতার মাহাত্ম্য ও তার প্রভাব সম্পর্কীয় বিষয়টি উপসংহারে উল্লেখ করবো সেটি হল— আধুনিক সমাজের প্রায় প্রতিটি মানুষ স্বীকার করেন ত্রাতার ভূমিকায় ঈশ্বরের আবির্ভাব। বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধদেব, খ্রিস্টধর্মে যিশুখ্রিস্ট, ইসলাম ধর্মে হজরত মহম্মদ আর সনাতন ধর্মে শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ অবধি কতই না যুগে যুগে যুগাবতার বা শ্রীভগবানের আবির্ভাব কোটি কোটি জনগণের মধ্যে আজও চিরস্মরণীয়।

গীতায় বর্ণিত –

পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে।

সুতরাং আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে যে নীতি, ধর্মতত্ত্ব, পরহিতসাধনের কাহিনী গ্রন্থিত আছে তার প্রাসঙ্গিকতা আজও হারিয়ে যায়নি। মনুষ্য জাতি যতদিন এই পৃথিবীতে থাকবে, ততদিন মহাকাব্যের এই কাহিনীগুলির দ্যুতি তাদের জীবনের চলার পথকে আলোকিত করবে এই আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। প্রাচীনভারত, সমাজ ও সাহিত্য: অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯৮

২। ভারত ও ভারততত্ত্ব, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ: অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য, সম্মাননাগ্রন্থ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪

৩। কথা ও কর্মে এথিকস্, সোমনাথ চক্রবর্তী, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭৩, ২০০২

৪। বাল্মিকী রামায়ণ: সারানুবাদ রাজশেখর বসু, এম.সি সরকার অ্যান্ড সনস্ লিঃ, কলকাতা– ১২, ১৩৫৩

৫। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত: সারানুবাদ রাজশেখর বসু, এম.সি সরকার অ্যান্ড সনস্ লিঃ, কলকাতা- ১২, ১৩৫৬

৬। মহাভারতের অষ্টাদশী: নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম সং.- এপ্রিল ২০১৩

৭। The Position of Women in Hindu Civilization: From Prehistoric Times to the Present Day: এ. এস. অলতেকার, মতিলাল বেনারসীদাস প্রাইভেট লিমিটেড, নতুন দিল্লী, ২য় সং.- ২০০৯

Citation: **ঘোষ. কো.**, (2025) "নৈতিক-অনৈতিকতায় ভারতীয় মহাকাব্যের চরিত্ররা : একটি সমীক্ষা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-03, March-2025.